পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

পড়াশোনার সঙ্গে সংগীতের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সংগীতের কিছুটা ভূমিকা আছে। কলকাতার এক বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে সেইসব কথা লিখেছেন **শর্মিলা চন্দ্র**।

কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে

গান শোনো

গান ভালোবাসেন না এমন মানুষ গোটা বিশ্বে বোধহয় কোথাও মিলবে না। সুখ, দুঃখ, আনন্দ সবকিছুতেই তো গানকে সামিল করা যায়। গান মনের কথা প্রকাশের একটি মাধ্যম বলা যায়। এছাড়া গান আমাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের একটি অংশ। মন ভালো থাকলে গান শুনলে সেই ভালো লাগা যেমন দ্বিগুণ হয়ে যায়, ঠিক তেমনই মন খারাপ থাকলে গান শুনলে বা গুনগুন করে দু'লাইন গাইলে মনটা অনেকটাই ভালো হয়ে যায়। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও গানের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, পড়ার ফাঁকে একটু করে গান শুনলে পড়ায় এনার্জি পাওয়া যায়। কারণ গান শুনলে আমাদের মস্তিষ্কের নার্ভগুলো অনেক বেশি সক্রিয় হয়। আর নার্ভ সক্রিয় থাকলে কাজের তো এনার্জি বাড়বেই। অনেক স্টুডেন্টকেই দেখা যায় অঙ্ক করতে করতে হালকা মিউজিক শুনছে। বাড়ির লোক অনেক সময়ই এই দৃশ্য দেখে বকাবকি করতে থাকেন। ভাবেন অঙ্ক করতে করতে গান শুনলে মনোযোগ হয়তো নষ্ট হতে পারে। বরং উল্টোটাই। অঙ্ক করার সময় হালকা মিউজিক শুনলে মনোযোগ বাড়ে। তার কনসেন্ট্রেশন শুধুমাত্র অঙ্কের দিকেই থাকে।

গান মানুষের যে কোনও কাজে কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে সহায়তা করে। লক্ষ করলে দেখা যায় অনেকে রান্না করতে করতে গান করছেন। হয়তো কেউ কম্পিউটারে বসে কাজ করছেন, কাজের ফাঁকে গুনগুন করে উঠলেন। আবার দেখা যায় যে কয়লা ভাঙছে বা ধান কাটছে সেও হয়তো গান করতে করতে তার কাজটা করছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, গান করলে বা ভালো গান শুনলে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোর পরিবর্তন হয়। যার ফলে শারীরিক একটা পরিবর্তন হয় এবং কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ে। শুধু তাই নয়, অসুস্থ মানুষকে গানের মাধ্যমে অনেকটাই সুস্থ করে তোলা যায়। কারণ গানই সরাসরি মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে প্রভাব ফেলতে পারে।'

তাঁর মতে, 'আমার কাছে এমন অনেক বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আসেন যারা হয়তো অনেক দিন ধরে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। ফলে পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে। আড়াই থেকে কুড়ি বছর বয়সি স্টুডেন্ট আসে। এরকম ক্ষেত্রে আমি স্টুডেন্ট এবং তার বাবা-মায়েদের অ্যাডভাইস করি তাদের গান শোনার অভ্যাস করাতে। অথবা কারওর যদি গানের প্রতি বেশি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে তাকে পড়াশোনার জন্য অযথা চাপ না দিয়ে গান নিয়ে থাকতে দিতে। এই অ্যাডভাইস দেওয়ার পর কিছুদিন পর যখন তাঁরা এসে ভালো ফিডব্যাক দেন তখন আমাদের ভালো লাগা বেড়ে যায়। এরকম অনেক অটিস্টিক বাচ্চা গান শুনে ভালো রেসপন্স করে। মানসিক ভারসাম্যহীন পেশেন্টদের ভালো হওয়ার ক্ষেত্রে সংগীত একটা বড় ভূমিকা রাখে। গান তাদের সুস্থ হয়ে ওঠার পথ সুগম করে।'

গান মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সেই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেউ গান শুনতে ভালোবাসেন আবার কেউ গান গাইতে ভালোবাসেন। গান আমাদের শরীরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বললেও বোধহয় ভুল হবে না।

আমাদের জীবনে গানের কতটা ভূমিকা রয়েছে এবং পড়াশোনার সঙ্গে গানের ঠিক কতটা যোগ রয়েছে এই প্রসঙ্গে ভূগোলের শিক্ষিকা নবনীতা চৌধুরীর জানান, 'গান আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের সঙ্গে গান জড়িয়ে রয়েছে। ভালো লাগা, খারাপ লাগা, আনন্দ, খুশি সবকিছুর সঙ্গে গানের নিবিড় সম্পর্ক। আর পড়াশোনার কথা যদি বলা হয়, তাহলে বলব এই ক্ষেত্রেও গানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি তো স্টুডেন্টদের সবসময় বলি পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগলে গান শুনবে অথবা গল্পের বই পড়বে। অনেক সময় এমনও হয় মাঝে মাঝে ক্লাসে গিয়ে দেখি স্টুডেন্টদের ঠিক পড়ায় মন নেই, সেই সময় কিছুক্ষণ গান নিয়ে হয়তো একটু চর্চা করলাম, যে স্টুডেন্ট ভালো গান করে তাকে একটা গান শোনাতে বললাম, তারপর দেখা যায় ওদের মধ্যে পড়ার প্রতি ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে।'

অঙ্কের শিক্ষক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'গান শুনতে শুনতে অঙ্ক করলে মনোযোগটা শুধুমাত্র অঙ্কের প্রতি থাকে। স্টুডেন্টদের বলি, ইচ্ছে হলে অঙ্ক করতে করতে গান শুনতে পারো, তবে মনোযোগটা যেন অঙ্কের প্রতি থাকে।'

এই বিষয় সংগীতশিল্পী লাজবন্তী রায় জানান, 'গান জীবনের আনাচে-কানাচে জড়িয়ে। গান তো আমার জীবন। সেই কোন ছোটবেলা থেকে গানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমার বেশ মনে আছে যখন আমার পড়তে ভালো লাগত না তখন গান শুনতাম অথবা হারমোনিয়াম নিয়ে গানের রেওয়াজ করতে বসে যেতাম। হয়ে গেলে আবার পড়তে বসতাম। পড়ার প্রতি এনার্জিও পেতাম। একটাই কথা বলব, গান এমনই একটা মাধ্যম যেটা মানুষকে ভালো রাখতে পারে।'

গান কেন গাইবে বা শুনবে

ডা. কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

- দীর্ঘক্ষণ পড়ার পর ক্লান্তি লাগলে হালকা গান শোনা যেতে পারে। এতে পড়ায় আবার মনোযোগ আসে।
- অনেক সময় সব রকম গান ভালো লাগে না, এমন অনেক সুর আছে যেগুলো দুঃখের সময়তেও ভালো লাগে, আবার এমন অনেক সুর আছে যেগুলো শুনলে মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে। সেই কারণে বলব পড়ার ফাঁকে গান শুনলে এমন গান শোনা উচিত নয়, যেটা শুনলে বিরক্তি লাগতে পারে।
- অঙ্ক করতে করতে ভালো লাগলে হালকা মিউজিক শোনা যেতেই পারে। এতে কনসেন্ট্রেশন বাড়ে।
- গান গাওয়ার অভ্যাস থাকলে বা ভালো লাগলে মাঝে মাঝে একটু করে রেওয়াজ করে নেওয়া যেতে পারে।
- বাবা-মায়েদের উদ্দেশ্যে বলব, যদি কখনও দেখেন সন্তান পড়ায় ঠিক মতো মনোযোগ দিতে পারছে না, তাহলে তাকে গান শোনানোর অভ্যাস করান।

দু'য়ের পাতায় জেনারেল নলেজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর টিপস | তিনের পাতায় শিক্ষাগুরুর পরামর্শ ও উত্তরণের মুখোমুখি রোল নম্বর ওয়ান | চার ও পাঁচের পাতায় স্পেশাল টিউশন ইংলিশ গ্রামার ও সমাজ বিজ্ঞান | ছয় ও সাতের পাতায় আলোচনা, আটের পাতায় জেনারেল নলেজ

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

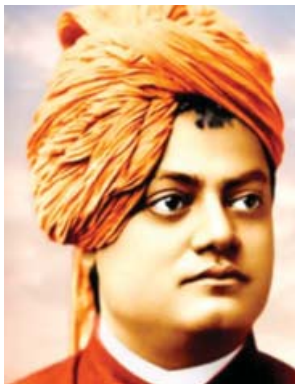

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে থাকা উৎকর্ষের প্রকাশ।
স্বামী বিবেকানন্দ

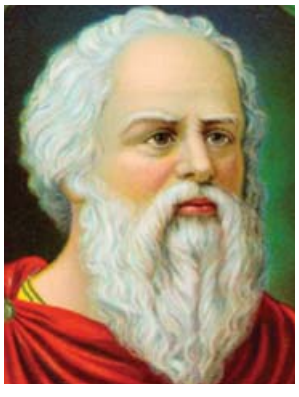

শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।
সক্রেটিস

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

বৃষ্টি ঘোষ

১ মে দিনটি পৃথিবীর অনেক দেশে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসাবে পালিত হয় যা 'মে দিবস' নামেও পরিচিত। ভারত সহ অনেক দেশেই এই দিনটি সরকারিভাবে ছুটির দিন। ১৮৮৬ সালের মে মাসে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক আন্দোলন ও আত্মাহুতিকে এদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশে পালিত হলেও, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এই দিনটি পালিত হয় না। 'শ্রমিক'—সভ্যতার প্রতিটি ইট, বালি, পাথরে যাদের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জড়িয়ে আছে, তাঁরা কিন্তু কখনওই সভ্যতার আশীর্বাদধন্য শ্রেণি ছিল না, এখনও নয়।

তবে এই মে দিবস পালন করার নেপথ্যে রয়েছে এক সোনালি কিন্তু বেদনাদায়ক ইতিহাস। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। শ্রমিকরা তখনও শোষিত। সপ্তাহে ছয় দিনের প্রতিদিনই গড়ে প্রায় দশ থেকে বারো ঘণ্টার অমানবিক পরিশ্রম করতেন তাঁরা। কিন্তু বিপরীতে মিলত নগণ্য মজুরি। অনিরাপদ পরিবেশে রোগ-ব্যাধি, আঘাত, মৃত্যুই ছিল তাঁদের নির্মম সাথী। তাঁদের পক্ষ হয়ে কথা বলার মতো কেউ ছিল না তখন। ১৯৬০ সালে শ্রমিকরাই মজুরি না কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রম নির্ধারণের প্রথম দাবি জানান। কিন্তু কোনও শ্রমিক সংগঠন না থাকায় এই দাবি জোরালো করা সম্ভব হয়নি। এই সময় সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। শ্রমিকরা বুঝতে পারে বণিক ও মালিক শ্রেণির এই রক্ত শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগঠিত হতে হবে। ১৮৮০-'৮১ সালের দিকে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করেন Federation of organized traders and labor unions of the United States and Canada (১৮৮৬ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় American Federation of Labour)। এই সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শক্তি অর্জন করতে থাকে। ১৮৮৪ সালে সংঘটি ৮ ঘণ্টা দৈনিক নির্ধারণের প্রস্তাব পাশ করে এবং মালিক ও বণিক শ্রেণিকে এই প্রস্তাব কার্যকরের জন্য ১৮৮৬ সালের ১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। তাঁরা এই সময়ের মধ্যে আওতাধীন সকল শ্রমিক সংগঠনকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংগঠিত হওয়ার বার বার আহ্বান জানান। প্রথমদিকে অনেকেই একে অবাস্তব অভিলাষ, অতি সংস্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু বণিক-মালিক শ্রেণির কোনও ধরনের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদী ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে থাকেন। এ সময় 'অ্যালার্ম' নামক একটি পত্রিকার কলাম 'একজন শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজ করুক কিংবা ১০ ঘণ্টাই করুক, সে দাসই' যেন আগুনে ঘি ঢালে। শ্রমিক সংগঠনদের সাথে বিভিন্ন সমাজতন্ত্র পন্থী দলও একাত্মতা জানায়। ১ মে-কে ঘিরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আয়োজন চলতে থাকে। আর শিকাগো হয়ে ওঠে এই প্রতিবাদ প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল।

১ মে এগিয়ে আসতে লাগল। মালিক শ্রেণি অবধারিতভাবে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ১৯৭৭ সালে শ্রমিকরা একবার রেলপথ অবরোধ করলে পুলিশ ও ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি তাদের উপর বর্বর আক্রমণ চালায়। ঠিক একইভাবে ১ মে-কে মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। পুলিশ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শিকাগো সরকারকে অস্ত্র সংগ্রহে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। ধর্মঘট আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শিকাগো বাণিজ্যিক ক্লাব ইলিনয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ২০০০ ডলারের মেশিনগান কিনে দেয়। ১ মে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩,০০,০০০ শ্রমিক তাঁদের কাজ ফেলে এদিন রাস্তায় নেমে আসেন। শিকাগোতে শ্রমিক ধর্মঘট আহ্বান করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক কাজ ফেলে শহরের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হন। অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, বিপ্লবী আন্দোলনের হুমকি সবকিছুই মিলে ১ মে উত্তাল হয়ে ওঠে। পার্সন্স, জোয়ান মোস্ট, আগস্ট স্পিজ, লুই লিং সহ আরও অনেকেই শ্রমিকদের মধ্যে পথিকৃত হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে আরও শ্রমিক কাজ ফেলে আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ। আন্দোলন চলতে থাকে। ৩ মে (কারও কারও মতে ৪ মে) ১৮৮৬ সালে সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর হে-মার্কেটের বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিকরা মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হন। আগস্ট স্পিজ সমবেত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছিলেন। হঠাৎ দূরে দাঁড়ানো পুলিশ দলের কাছে এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে, এতে এক পুলিশ নিহত হন এবং এগারোজন জখম হন, পরে আরও ছ'জন মারা যান। পুলিশ বাহিনীও শ্রমিকদের উপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে যা সাথে সাথেই রায়টের রূপ নেয়। রায়টে এগারোজন শ্রমিক শহিদ হন। পুলিশ হত্যা মামলায় আগস্ট স্পিজ সহ আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ছয় জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুই লিং একদিন আগেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন, অন্য একজনের পনেরো বছরের কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের আগে আগস্ট স্পিজ বলেছিলেন, 'আজ আমাদের এই নৈঃশব্দ্য, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে।'

২৬ জুন ১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্নর অভিযুক্ত আটজনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং রায়টের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনওই প্রকাশ পায়নি। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের 'দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার' দাবি অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। আর পয়লা মে বা মে দিবস প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দাবি আদায়ের দিন হিসাবে, পৃথিবীব্যাপী আজও তা পালিত হয়।

পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর টিপস

পড়ায় মনোযোগ বাড়ানোর কিছু টিপস দেওয়া হল:

● পড়তে বসার অন্তত পাঁচ মিনিট আগে থেকে মনটাকে স্থির করো। তারপর যে কাজটা করবে, সেটা হল, অমনোযোগিতা আনতে পারে এমন সব বিষয় মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।

● পড়াশোনার জন্য একটি ভালো স্থান দিতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থী পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। সে স্থানটি হওয়া দরকার বাড়ির সবচেয়ে নিরিবিলি জায়গাটা। পড়ার স্থানটি শুধু পড়ার কাজেই ব্যবহার করতে হবে। পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু হাতের কাছেই রাখো, যাতে বারবার উঠতে না হয়। তবে, পড়ার টেবিলে ফোন বা মোবাইল একেবারেই রাখবে না।

● পড়াশোনা শুরু করার আগেই পাঠের পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ চেষ্টা করতে হবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে পড়ার লক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, তা যেন অবশ্যই অর্জন করা সম্ভব হয়, বাস্তবায়নযোগ্য হয়। একজন শিক্ষার্থী তার নির্ধারিত লক্ষ্যের চেয়েও বেশি পড়াশোনা করতে পারে, যদি সম্ভব হয়, কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাটি যেন সহজে বাস্তবায়নযোগ্য হয়।

● একই বিষয় অনেকক্ষণ ধরে পড়লে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মনোযোগ ধরে রাখতে হলে বিষয় পরিবর্তন জরুরি। দু-এক ঘণ্টার বেশি কোনও সাবজেক্ট একটানা না পড়াই ভালো।

● সঠিক সময়ে সঠিক বিষয় নির্বাচন করার চেষ্টা করো। তোমার এনার্জি লেবেল যখন সবচাইতে ভালো থাকে তখন তোমার যে বিষয়টি সবচাইতে কঠিন মনে হবে, সেটা পড়ো। এতে বিষয়টি আত্মস্থ হবে তাড়াতাড়ি।

● সংশ্লিষ্ট কাজগুলো ভাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সময়কেও ভাগ করে নিতে হবে। প্রতিটি সময়ের অংশে পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে যা অবশ্যই সঠিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। যেমন: দু'ঘণ্টার মধ্যে বাংলা প্রথম পত্রের বই পড়া, প্রবন্ধের তিনটি প্রশ্ন পড়া শেষ করব কিংবা পাঁচটি গণিত সমস্যা সমাধান করব অথবা পরবর্তী এক ঘণ্টায় ইংরেজি পড়া শেষ করব, ইত্যাদি।

● শিক্ষার্থীদের শারীরিক সমস্যা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং পড়ায় মনোযোগের মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই শারীরিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিদিন সব খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ থেকেই কিছু কিছু সুষম খাবার খেতে হবে। বিশেষ করে প্রতিদিন সকালের বা দুপুরের খাবারে কিছু প্রোটিন যেন থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সুষম খাবার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ করবে এবং শরীরে রক্তে চিনির মাত্রা ঠিক রাখতে সহায়তা করবে।

● ভালো ঘুম প্রয়োজন। সময়মতো বিছানায় ঘুমোতে যেতে হবে। পরিমিত মাত্রায় ঘুমাতে হবে। যদি দীর্ঘদিন অপর্যাপ্ত ঘুম হয়, তাহলে তা শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

● প্রতিটি শিক্ষার্থীর উচিত পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো করা, হাঁটাহাঁটি করা, ব্যায়াম করা। বাড়ির ছাদে, মাঠে বা খোলা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি বা খেলাধুলো করলে মন প্রফুল্ল থাকবে। সেই সঙ্গে হালকা ধরনের ব্যায়ামও হয়ে যেতে পারে। এতে শরীরের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সৌম্যজিৎ পুরকায়স্থ

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

বিশেষ প্রবন্ধ

স্মরণীয় উনিশে মে

এনায়তি দেব দত্ত

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই॥'

সত্যি-ই ক্ষয় নাই। আমরা আজ গর্বিত সেই একাদশ ভাষা শহিদদের নিয়ে। জন্ম-জন্মান্তরেও এঁদের স্মৃতি ক্ষয় হবে না। এঁরা অমর হয়ে থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

১৯৬১-র ১৯ মে-র ভাষা আন্দোলন বরাক উপত্যকার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। মাতৃভাষার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল আন্দোলন। পথে পথে বিশাল মিছিল, জনস্রোত। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল প্রতিটি মন। পুলিশের লাঠিচার্জেও সত্যাগ্রহীরা একেবারে অনড়-অটল ছিলেন। অবশেষে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর বর্ষিত হল গুলি। রাঙা হয়ে উঠল রেলস্টেশন। বৈষম্যমূলক আচরণে পড়ল ছেদ। স্বীকৃতি পেল বরাক উপত্যকার মাতৃভাষা বাংলা। তবে এগারোটি প্রাণের বলিদানে।

১৯৬১ থেকে ২০১৭— ৫৬টি বছর অতিক্রান্ত। দিন বদলে গেল, রং বদলে গেল। ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের রূপও বদলে গেল। শৈশবের স্মৃতিকোঠায় চোখ রাখলে আমরা দেখি ১৯-'মে'র 'ভাষা শহিদ দিবস' পালনের রূপ অনেকটা পরিবর্তিত।

বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন আজকের দিনে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছনোর সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবে এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে উনিশের ভাষা আন্দোলনের চিত্র কীভাবে প্রভাব বিস্তার করছে সে বিষয়ে অনেক সময় প্রশ্ন থেকে যায়। এগারোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে, নাচে-গানে, গুরু-গম্ভীর আলোচনায় এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সেই বোধটা জাগানো সম্ভব কি?

১৯ মে-র সঠিক মূল্যায়ন হবে বাংলা ভাষাচর্চার মাধ্যমে। স্পষ্ট এবং সঠিক উচ্চারণে বাংলা বিষয় পড়ার ক্ষমতা। লেখার সময় বানানের শুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি বিষয়ে যদি বিশেষ নজর দেওয়া যায় তবেই মাতৃভাষার প্রতি অনেক বেশি সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

কিছু সংখ্যক ছেলে-মেয়ে আন্তরিক ভালোবাসায় পাঠ্যবিষয় বাংলাকে আত্মগত করে। এমনও আছে যাঁরা ১৯ মে 'ভাষা শহিদ দিবস' এইটুকু জানাই যথেষ্ট মনে করে। এমনকী এগারো শহিদের নামও হয়তো এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে না। তবে বিজ্ঞানের কল্যাণে গুগল সার্চ করলে সব কিছু হাতের মুঠোয় চলে আসে। কিন্তু নিজের মস্তিষ্কে তা ধরে রাখা একটু সমস্যাজনক ব্যাপার। হয়তো চর্চার অভাবও হতে পারে। তাই মনে হয় স্কুল-কলেজে বাংলা ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যদি পাঠদান করা হয় তবে ছেলে-মেয়েরা আরও বেশি উপকৃত হবে। কারণ গর্বের সঙ্গেই আমরা বলতে পারি এই লড়াই ভাষার অস্তিত্বের লড়াই, ভাষার মর্যাদার লড়াই। এই লড়াই নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতার সম্মিলিত সংগ্রাম।

আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি, একাদশ শহিদের বলিদানে স্বচ্ছন্দে ও সসম্মানে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রয়োগ করতে পারছি। এই কথাটা মনে রেখেই প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের উচিত এবং কর্তব্য নিজের ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া। অবশ্যই মনে রাখা দরকার ১৯ মে বরাক উপত্যকার কাছে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি ১৯ মে-র সেই মৃত্যুঞ্জয়ী একাদশ শহিদকে— বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরণীদেব নাথ, কুমুদরঞ্জন দাস, শচীন্দ্র পাল, হিতেশ বিশ্বাস, কমলা ভট্টাচার্য, কানাইলাল নিয়োগী, সুনীল সরকার, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং সত্যেন্দ্র দেব।

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

গৌরী ভট্টাচার্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, নেতাজি বিদ্যামন্দির, শিলচর

অধ্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি

'ছাত্রজীবনে তপস্যাই অধ্যায়ন'— এই কথাটি মনে রেখে এবং কথাটা ভালভাবে অনুভব করে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে হবে। ক্লাসের রুটিন মতো প্রতিদিনের পড়া শিখে নেওয়া চাই। তার উপর আছে Private tutor-এর দেওয়া পড়া এবং Home task। কাজেই ঘরের পড়া, Private tutor এবং স্কুলের পড়া মিলিয়ে একটা রুটিন বানিয়ে কখন কোনটা করতে হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। কোনও কিছু শিখে তা না দেখে লিখতে হবে। তখন বোঝা যাবে কতটুকু শেখা হল বা কী কী ভুল হল। এইভাবে করলেই শেখাটা হবে নির্ভুল। হাতের লেখা হবে সুন্দর, বানান নিয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকবে না। স্কুল বন্ধের দিনে পড়ার সময়টা একটু বাড়ানো দরকার, তবে খেলাধুলো বাদ দিয়ে নয়। সুস্থ দেহ ও মনের জন্য খেলাধুলোও প্রয়োজন। যে-বিষয়ে দুর্বল সেটা রোজই পড়তে হবে এবং অল্প হলেও না দেখে লিখতে হবে। বিভিন্ন স্কুলের এবং HSLC পরীক্ষার কয়েক বছরের প্রশ্ন যা test paper-এ পাওয়া যায় এগুলোর উত্তর অভ্যাস করতে হবে। এভাবে নিয়ম মেনে পড়লে পরীক্ষায় সফল হবেই।

কোনও বিষয় যা স্কুলে পড়ানো হয়েছে বাড়িতে এসে ওটা পড়ে হয়তো বুঝতে পারলে না, তখন ভয় পেয়ে ওটা ছেড়ে দেবে না। বার বার পড়বে এবং দেখবে একটু একটু করে বিষয়টা বুঝতে পারছ তখন তোমার আগ্রহ বেড়ে যাবে ওটা শেখার জন্য।

পড়ার বই ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ার অভ্যাস করা দরকার। তাতে জ্ঞানবৃদ্ধি যেমন হয় স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাই ছাত্রাবস্থায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি বই পড়া উচিত। এই বইগুলোতে এমন সব চরিত্র থাকে যেগুলো অনুসরণ করে আদর্শ মানুষ হওয়া যায়। লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য শুধু ভালো চাকরি পেয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা নয়। প্রকৃত মানুষ হওয়াই আসল উদ্দেশ্য। 'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।'

টিম উত্তরণ
বিদিশা রায়চৌধুরী (গুয়াহাটি), **এনায়তি দেব দত্ত** (শিলচর)

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

পড়াশোনার অবসরে গান-বাজনা করি

সুতন্বী চক্রবর্তী দশম শ্রেণি, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন, কাটাখাল (কর্ণমধু)

কাটাখাল (কর্ণমধু) সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের একজন মেধাবী ছাত্রী সুতন্বী চক্রবর্তী। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি খুব আগ্রহ সুতন্বীর। প্রতি বছরই নতুন ক্লাসে প্রথমস্থান অধিকার করে আসছে। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ-গান, আর্ট আবৃত্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বেশ ভালো দখল আছে তার। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে গেলে কেমন ভাবে পড়াশোনা ইত্যাদি করতে হবে তা নিয়ে সুতন্বী উত্তরণের মুখোমুখি হল।

উত্তরণ: তুমি বরাবরই ক্লাস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছ। এই আনন্দটা আগামীতেও ধরে রাখার জন্য তুমি নিজেকে কীভাবে তৈরি করছ?

সুতন্বী: আমি এবার দশম শ্রেণিতে উঠেছি। আগামী বছর মাধ্যমিক। স্কুলের পরীক্ষায় প্রতি বছরই প্রথম হই। তবে মাধ্যমিকে প্রথম হওয়ার স্বপ্ন দেখতে গেলে পড়াশোনার মাত্রা আরও বাড়াতে হবে। কারণ স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হলেই যে মাধ্যমিকেও প্রথম হতে পারব সে-রকম ভাবা ঠিক নয়। তবে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করতে চাই।

উত্তরণ: তুমি সারাদিনে কতটুকু পড়াশুনা করো?

সুতন্বী: আমি পড়াশুনার নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও যখনই সময় পাই যে কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করি। সব সময় রুটিন মেনে পড়াশোনা করতে পারি না। পড়া মনে রাখার জন্য খুব বেশি লিখি। পরীক্ষার আগে বেশি পড়লাম আর সারাবছর কম পড়লাম এটা করি না। আমি একই গতিতে পড়াশোনা করে যাই। তবে পরীক্ষার আগে আমি বেশি চাপ কখনও নিতে চাই না।

উত্তরণ: প্রিয় বিষয় কী?

সুতন্বী: অঙ্ক আমার খুব পছন্দের বিষয়।

উত্তরণ: পড়াশুনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা কে করেন বেশি?

সুতন্বী: ঘরে মা-বাবা খুব বেশি সহযোগিতা করেন। আর স্কুলে অবশ্যই দাদামণি-দিদিমণিরা। আমার নিজের পরিশ্রম আর শিক্ষকদের সহযোগিতায় আমি এতবছর ধরে ভালো ফল করে আসছি।

উত্তরণ: পড়াশুনার সঙ্গে গান-নাচ করার সময় কী করে বের করো?

সুতন্বী: এটা আমার খুব আনন্দের জায়গা। যখনই পড়াশোনায় খুব চাপ মনে হয় তখনই চাপ মুক্ত হওয়ার জন্যে গান করি। কখন আঁকি করি। কখনও-বা আবৃত্তি করি।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

সুতন্বী: আমার শিক্ষিকা হওয়ার খুব ইচ্ছে। কারণ শিক্ষকতার কাজ আমার খুব ভালো লাগে। আমি এখন মা-বাবা, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি।

উত্তরণ: তুমি সফল হও। উত্তরণের পক্ষ থেকে রইল শুভকামনা।

জানো কি?

● পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়। গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এ ব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান-প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কোলিন। খাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় বলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

● ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার গবেষণায় জানা গেছে, লাল রং স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে (improve concentration)। তাই পড়ার টেবিলে লাল কোনও বস্তু, লাল বইয়ের কভার, লাল পেন, লাল ওয়ালপেপার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারো বৈজ্ঞানিক উপায়ে মনোযোগ বাড়ানোর জন্য।

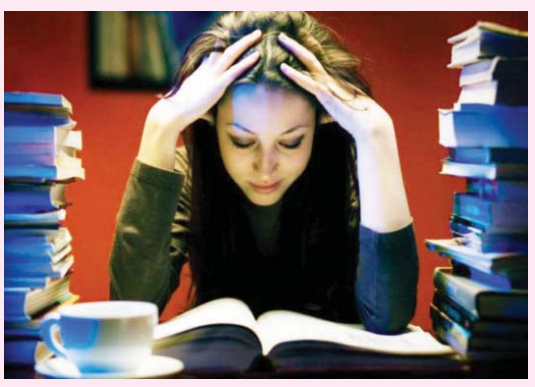

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

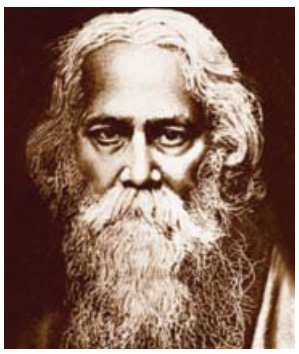

শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

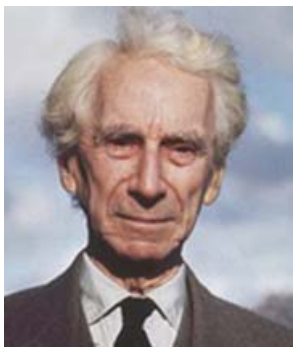

মানুষের সুখী হওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার বুদ্ধির—এবং শিক্ষার মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।
বার্ট্রান্ড রাসেল

স্পেশাল টিউশন | ইংলিশ গ্রামার

Correction of Common Errors

অরুণ সিংহ
সহকারী শিক্ষক, উধারবন্দ শিক্ষা সদন

Correction of Common Errors শুধু অ্যাকাডেমিক পরীক্ষার জন্য নয়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই Common Errors নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বাক্যের যে কোনও অংশে ভুল থাকবে। এটিকে শুদ্ধ করে লিখতে হবে। এর জন্য ব্যাকরণের নিয়ম ভালো করে জানা খুব জরুরি। যদি দুটি সাবজেক্ট and দিয়ে যুক্ত হয় তাহলে Verb plural হবে। যেমন'— Binoy and Saju are sitting here.

কিন্তু and দিয়ে যুক্ত হলেও যদি একই ব্যক্তি বোঝায় তাহলে singular হয়। যেমন'— The principal and secretary of the college is present in the meeting. As well as দিয়ে দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে verb-টি প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে বসবে। যেমন'— He as well as his friends was dancing.

কোনও abjective-এর আগে The বসিয়ে যদি noun বানানো হয় তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে plural হয়। যেমন'— The poor are working hard. Each দিয়ে শুরু হলে সব সময় singular হয়। যেমন'— Each of the student was given a pen.

একটি বাক্যে যদি 1st person, 2nd person ও 3rd person এক সঙ্গে থাকে তবে প্রথমে বসবে 2nd person এর পরে বসবে 3rd person আর একদম শেষে থাকবে 1st person। যেমন'— You, he and I went there. কিন্তু ভুল স্বীকার করলে নিয়মটা ঠিক তার উলটো হবে। He is comparatively better today. এখানে comparatively শব্দটা ব্যাকরণের ভাষায় superflous বলে। মানে অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা। Better শব্দটা থাকার জন্য comparatively-এর প্রয়োজন হয় না। তাই সঠিক বাক্যটি'— He is better today হবে। No less than fifty men was present there. এই বাক্যে দুটি জায়গায় ভুল আছে। একটি হল less আর অন্যটি হল was। যেহেতু মানুষ countable তাই less-এর জায়গায় fewer বসবে আর verb plural হয়ে যাবে। তাই শুদ্ধ বাক্যটি No fewer than fifty men were present there হবে। He bought a computer. এখানে computer-এর পরে set শব্দটি যোগ করতে হয়। অনুরূপভাবে radio set, mobile set, TV set ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। He left the place with bag and baggage. "Bag and baggage" এটি একটি ফ্রেইজ যার অর্থ 'যথা সর্বস্ব লইয়া' এটিতে with যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ বাক্যটি'— He left the place bag and baggage হবে। He resembles to his father. Resembles এর পরে "to" preposition-এর প্রয়োজন নেই। She entered into the hall. Enter মানেই ভিতরে ঢোকা। তাই into-র দরকার নেই। শুদ্ধ বাক্যটি'— She entered the hall হবে। One of my brother live in Paris. এই বাক্য দিয়ে যা বোঝানো হচ্ছে তা হল, আমার অনেক ভাইদের মধ্যে একজন প্যারিসে থাকে। মানে ভাই অনেক, প্যারিসে থাকে শুধু একজন। তাই শুদ্ধ বাক্যটি'— One of my brothers lives in Paris হবে। He said this infront of the principal. এখানে front শব্দটা ব্যবহার হয় না। Front শব্দটা আসলে আগে বোঝায়। যেহেতু বাক্যটিতে অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপস্থিতিতে বোঝাইতে চাইছে তাই শুদ্ধ বাক্যটি'— He said this in presence of the principal হবে। This book is better than Kunal. এখানে, বইটি কুনালের চাইতে ভালো বোঝাতে চাইছে না বরং এটি কুনালের বই থেকে ভালো বোঝাতে চাইছে। তাই শুদ্ধ বাক্যটি'— This book is better then that of Kunal হবে। The climate of Kashmir is much colder than Assam.

অনুরূপভাবে The climate of Kashmir is much colder than that of Assam হবে। Messi gave two goals. বাংলাতে 'গোল' দেওয়া বলা হয় ঠিক কিন্তু ইংরেজিতে এটাকে score বলতে হয়। তাই Messi scored two goals হবে। This is the most expensive car of the world. এখানে preposition তা আসলে ভুল। তাই অর্থটা আকাশ-পাতাল ফারাক হয়ে যায়। গাড়ির মালিক কিন্তু পৃথিবী নয়। এই গাড়িতে পৃথিবী চড়বে না। যেহেতু এই বাক্য দিয়ে- 'এটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামি car বোঝাচ্ছে, তাই শুদ্ধ বাক্যটি হবে'— This is the most expensive car in the World.

বিশেষ রচনা

ইংরেজি শিক্ষার সুফল

সুপ্রভাত লাহিড়ী

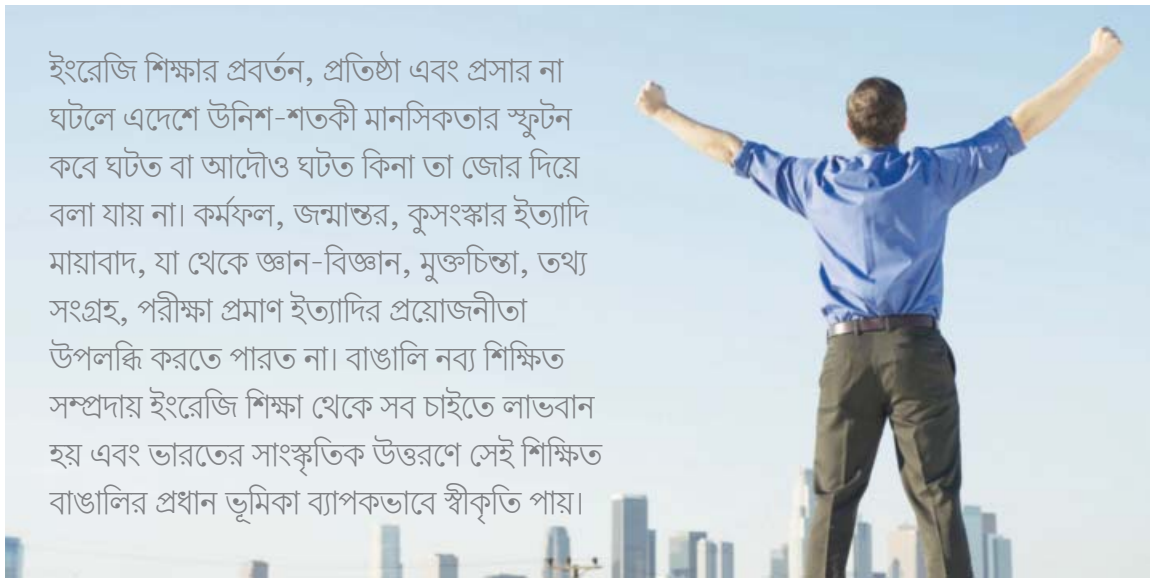

দেশ স্বাধীনের অনেকগুলো বছর হয়ে গেল। উপনিবেশতন্ত্র কোনও দেশের পক্ষেই যেমন কাম্য হতে পারে না, তেমনি সব কিছু গলদের কারণ হিসাবে ইংরেজ শাসনকে দায়ী করা বোধহয় পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের ইতিবাচক সুফল ভূমিকা অনুভূত এবং স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিবিহীন এ-কথা অবশ্য বলা যাবে না। কারণ সে শিক্ষা সমাজের নীচের তলার মানুষদের কাছে পৌঁছায়নি। অবশ্য একথাও ঠিক যে ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তী সময়েই কি সেই ব্যবস্থা ছিল? সমাজের নিম্নবর্গীয়রা, চাষিরা কি স্কুলে যেত, বই পড়ত?

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার না ঘটলে এদেশে উনিশ-শতকী মানসিকতার স্ফুটন কবে ঘটত বা আদৌও ঘটত কিনা তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কর্মফল, জন্মান্তর, কুসংস্কার ইত্যাদি মায়াবাদ, যা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা প্রমাণ ইত্যাদির প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করতে পারত না। বাঙালি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা থেকে সবচাইতে লাভবান হয় এবং ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরণে সেই শিক্ষিত বাঙালির প্রধান ভূমিকা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায়।

ইংরেজ শাসনেই ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ভারতীয় রেঁনেসাস-এর সূচনা হয়েছিল। সর্ববিধ জ্ঞান আহরণ এবং তার ভিতর দিয়েই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে প্রবেশ করে। এদেশের সংস্কৃতির ভাবধারার রূপান্তরের সম্ভাবনা খুলে যায়। রাজা রামমোহন রায় বাঙালির চেতনাকে যুক্তিনির্ভর সজাগতা এবং নীতিবোধের সংমিশ্রণে মূল্যায়ন করে বাঙালিকে যুক্ত করেন বিশ্বের ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে। তিনিই চেয়েছিলেন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন। বিদ্যাসাগরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজি সূত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে, ফলস্বরূপ কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার প্রভাব থেকে মুক্ত জ্ঞান তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেবে। যদিও আমাদের সমাজব্যবস্থার বিস্তর বাধায় তাঁর সব আশা পূরণ হয়নি। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ফলে বঙ্গসংস্কৃতির প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল। বাঙালি শিক্ষিতদের একটা বড় অংশ সমাজকে নতুন ভাবে দেখতে শুরু করেন। ফলে বাংলাসাহিত্যে প্রাণের জোয়ার আসে। বাংলা কবিতায় তেজ, গতি এবং মহত্ববোধ আনেন মাইকেল মধুসূদন। অপরদিকে বাংলা গদ্যকে তার শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে দিলেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র।

ইংরেজি শিক্ষা এঁদের মনে দেশের এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বাড়িয়েছে বই কমায়নি। এঁরা ইংরেজি ভাষা যত্ন করে শিখেছিলেন, তার ফলে নব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাবধারণাকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করে বাঙালি চেতনায় নবদিগন্ত খুলে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে সংখ্যায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ধর্মসংস্কার আন্দোলনে, সংস্কৃতির প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রধান হয়ে ওঠে বাঙালি।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে লাভ ছাড়া যে ক্ষতি হয়নি তার প্রমাণ হল এই যে শিক্ষিতজনেরাই এদেশে গড়ে তুলেছেন সমাজবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাসচর্চা, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গে অবশ্যই আধুনিক সাহিত্য। সেই সময়ের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মনীষীদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় হলেন'— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা সহ আরও অনেক বাঙালি মনীষী। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর কনিষ্ঠদের মধ্যে যাঁরা বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষা যত্ন করে শিখেছিলেন তাঁরা হলেন রাজশেখর বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ গুণিজনেরা। তাই ইংরেজি শিক্ষার ভালো দিকগুলো লক্ষ্য করলে নতুন প্রজন্ম ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

ভারত এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

অমরকৃষ্ণ পাল
অধ্যক্ষ, ক্রিয়েটিভ অ্যাকাডেমি, গুয়াহাটি

দশম শ্রেণির মূল গ্রন্থের অনুশীলনী ও দীর্ঘ প্রশ্নের উত্তর

১) ভারতের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের কথা সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর: সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এবং বৈচিত্রময় জীবনের মাঝে ঐক্যবোধ—ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সমগ্র ভারতে নানা ভাষা ও নানা সংস্কৃতির বৈচিত্র আমরা লক্ষ্য করেছি। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক। আদিকাল থেকে পরস্পরের মধ্যে এই ভাবধারা চলে আসছে। ভিন্নতার মাঝে মিলনের সুর বেজে ওঠেছে। সময়ে সময়ে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের ভাষায় তা প্রমাণ পেয়েছি আমরা।

মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়াও অনেকের লেখনি মানুষকে একই সূত্রে বাঁধতে সাহায্য করেছে। ইতিহাস, ভূগোলের পাতায় সাম্রাজ্যাদ, রাজনৈতিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক উদারতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থে জাতিতে জাতিতে ঐক্য ও মিলনের কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

২) 'ভারতের প্রাচীন যুগে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আত্মা নিহিত হয়ে আছে বললে অতিরিক্ত করা হবে না'—বাক্যটির ভাবার্থ আলোচনা করো।

উত্তর: ভারতের প্রাচীন যুগে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্মা নিহিত—কথাটি সত্য। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কালিদাস, বানভট্ট প্রত্যেকটি লেখনি ভারতীয় সাহিত্যের ধারা বহন করে চলেছে।

যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষী, জ্যোতিষী, সাধক, মহাপুরুষ, পীর, সুফি তাঁদের অক্লান্ত সাধনার ফল হিসাবে তাঁদের যে জ্ঞানের সার রেখে গেছেন—পরবর্তী সাহিত্যগুলিকে তা আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের জীবন দর্শন, ধর্ম বিশ্বাস, রাজনীতি, চিকিৎসা বিদ্যা, সাহিত্য ইত্যাদি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের চলার পথের পাথেয় বলতে পারি। গোটা ভারতবাসীর জীবনে এগুলির প্রভাব আজও বর্তমান। মাতা-পিতা, গুরুজন, অভিভাবক, শিক্ষক-ছাত্র, অতিথি সবার জীবনে এসব গ্রন্থে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, মোক্ষ, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি ধারণাগুলি অনেক গ্রন্থের পাতায় উজ্জ্বল আকারে ভেসে উঠেছে। মানুষের মনে এসব গ্রন্থ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। যেমন—'সত্যমেব জয়তে' (মুণ্ডক উপনিষদ), 'অহিংসা পরম ধর্ম' (মহাভারত), 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী' (রামায়ণ), 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (মহোপনিষদ), ইত্যাদি অমোঘ বাণীগুলি ভারতীয় মনস্তত্ত্বকে প্রেরণা জোগাতে সক্ষম হয়েছে।

৩) ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিষয়ে লেখো।

উত্তর: প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম ব্যবস্থায় উপাস্য দেবতার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক ধর্ম ব্যবস্থাতে অনেক দেবদেবীর সঙ্গে একেশ্বরের ধারণা বিদ্যমান ছিল। ভারতের প্রাচীনতম ধর্মীয় পরম্পরা, বিশ্বাস ও রীতি-নীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাপারে অমিল খুঁজে পাওয়া গেলেও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এদের কিছু মূল তত্ত্বের মধ্যে বিরোধ থাকলেও ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্ব, ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও সংঘর্ষ হয়নি। একারণে হিন্দু ধর্মের ভিতরেই অনেক পন্থা উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালের রাজবংশে ধর্মীয় উদারতার নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের গির্ণারে থাকা দ্বাদশ শিলালিপিতে লেখা বেশ কিছু কথা বিশেষ উল্লেখনীয়। সেখানে বলা হয়েছে—কেউ যেন নিজের ধর্মের প্রশংসার পাশাপাশি অন্যের ধর্মকে হীন বলে না ভাবে। বরং সব ধর্মের সার গ্রহণ করে সমন্বয়ের পথ অলম্বন করতে হবে। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে এই ধরনের বহু মূল্যবান কথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বর্তমানে গোটা বিশ্ব আজও সমানেই তা অনুসরণ করে চলেছে।

৪) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক স্বতন্ত্র পারম্পরিক পরিচয় কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করো।

উত্তর: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক স্বতন্ত্র পরিচয় সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার উর্বর সমতল ভূমিখণ্ডকে নিয়ে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অন্য রাজ্য ক'টি ঘিরে রয়েছে। ভুটান, চিন, মায়ানমার বাংলাদেশ —এইসব বিদেশি রাষ্ট্রগুলি অসমের চারদিকে অস্থান করছে। এগুলি সবই পাহাড়ি রাজ্য। এইসব রাষ্ট্রের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে প্রাচীন অসমের রাজনৈতিক ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অসমে রাজবংশের শাসনকালে পাশের অঞ্চলগুলির স্থানীয় শাসকেরা অসমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। ফলে ওই যুগে রচিত ইতিহাসে অসমের বহু তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রাজ-পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সামরিক সাহায্য আদান-প্রদান করা এবং দূত প্রেরণের ব্যাপারটিও সহজ হয়ে পড়েছিল। অসম এবং এর আশপাশের জনজাতীয় লোকেরা অধিকাংশ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর ছিল।

৫) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ধর্মীয় বাতাবরণের বিষয়ে সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ক'টি রাজ্যে ব্রিটিশ শাসনকালে পাহাড়ি লোকেদের মধ্যে মিশনারিরা খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে অসমে আর্যভাষা ও হিন্দুধর্মের প্রসার অতি প্রাচীনকালে ঘটেছিল। অনুরূপে মণিপুর, ত্রিপুরা ও বঙ্গদেশেও হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটে। মণিপুরের অধিকাংশ চৈতন্যপন্থী। ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাসের ফলে এখানে মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মেঘালয়ের পূর্বের বাসিন্দারা প্রকৃতির উপাসক ছিল। খাসি, গারো, জয়ন্তীয়ারা ১৮৩০ সাল থেকে ক্রমে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। বর্তমানে এখানকার মানুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। মিজোরামেও অধিকাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তারা তাদের নিজেদের পরম্পরাগত উৎসব, গান, কথা-বার্তা, চাল-চলন, তথা সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়।

৬) অসমের চিত্রকলার ঐতিহ্যের বিষয়ে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর: প্রাচীন ভারতের চিত্রকলার ঐতিহ্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তর ভারতীয় নাগর, দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় এবং বিন্ধ্য ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যভাগে দেখতে পাওয়া যায় বেসর শৈলী। উত্তর ভারতের মন্দিরগুলি উত্তরের অংশগুলি দেখতে অর্ধ-বৃত্তাকার। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির উত্তরের অংশগুলি দেখতে আয়তাকার হয়ে উত্তরের দিকে ছোট। অন্যগুলিতে নাগর এবং দ্রাবিড় শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। অনেক মন্দিরের চূড়া চওড়া থেকে সুচলো আকৃতির। আবার অনেক দেব-দেবীর মূর্তি সারি সারি ও খাঁজ কেটে নির্মিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য কারিকরি ও শিল্প নৈপুণ্য নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে — সে বিষয়টি অবশ্য স্পষ্ট।

দশম শতকে থেকে অসম, রাজস্থান, ওড়িশা, মহীশূর, তাঞ্জোর ইত্যাদি স্থানে তালপাতা, সাঁচি পাতা, পাটের কাড় ইত্যাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কন করা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতিকায় চিত্র অঙ্কনের ব্যাপারে বিশেষ কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলার কথা বলা ছিল। ইহাকেই বলা হয় চিত্রকলার ষড়াঙ্গ। যেমন— মাপ-জোখ, আবেগ-অনুভূতি, প্রকাশ ভঙ্গি, কলা প্রদর্শন, সাদৃশ্য জ্ঞান, তুলি ব্যহারের নিয়ম ইত্যাদি। সুলতানি আমলে পারস্য দেশীয় কলা-কুশলী অনুসরণ করে ভারতে প্রথম চিত্রকলার সূত্রপাত ঘটে। মোগলযুগের চিত্রগুলিতে সম্রাটদের ছবি, দরবার, যুদ্ধ জয়, শিকার, বাগিচা, ফুল, গাছ-লতা, জীবজন্তু ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয় এবং ধীরে ধীরে শিল্প কলার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় ঘটে।

৭) অসমের ধর্মীয় ভিন্নতা ও সংহতির বিষয়ে লেখো।

উত্তর: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ লোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ও জনজাতীয় ধর্মপন্থীর মানুষের বসবাস। হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রধানত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং সৌরপন্থী লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। অসমের বিভিন্ন স্থানে অনেক শক্তিপীঠ দেখা যায়। তার মধ্যে কামাখ্যা মন্দির পৃথিবী বিখ্যাত।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে (১২০১-১২৫০) অসমে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশের তথ্য পাওয়া যায়। হাজোর পোয়ামক্কা ইসলাম ধর্মালম্বী লোকেদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। মহারাজ গদাধর সিংহের আমলে সুফি সাধক আজান পীরের আগমন ঘটে। রাজা রঞ্জিত সিংহের নির্দেশে অসমে যেসব সৈন্য এসেছিল তাদের বংশধররা এখানে থেকেই গিয়েছিল। তারা এখানে আজও শিখ ধর্ম পালন করে চলেছে। অসমের পূর্ব প্রান্তে বসবাসকারী টাই-কাফে, তুরুং, আইতান, খামটি, খামায়াং, নরা ইত্যাদি গোষ্ঠীর লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। মধ্যযুগের মহারাজরা উদার ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্য উপাসনালয় তৈরির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন এবং সময়ে সময়ে সব রকমের সাহায্য, দান ইত্যাদি করে গেছেন।

৮) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্য ক'টির তুলনায় অসমে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, সংমিশ্রণ এবং বিবর্তন কেন অধিকতর? আলোচনা করো।

উত্তর: গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় অসমের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, সংমিশ্রণ এবং বিবর্তন অধিকতর তার প্রমাণ আজও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিটি জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিদ্যমান। এর জন্য এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আহোম রাজবংশের আমলে অসমের নিকটবর্তী রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে এক সুসম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল—তার বহু তথ্য সে-সময়কার ইতিহাসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। পাশাপাশি বসবাসকারী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসার সম্পর্ক, বিবাহ, উৎসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সুসম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার উর্বর সমতল ভূমিখণ্ডকে নিয়ে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অন্য রাজ্যগুলি অবস্থিত। এদিকে ভুটান, চিন, মায়ানমার, বাংলাদেশ —এসব বিদেশি রাষ্ট্রগুলি অসমের চারদিকে ঘিরে আছে। এগুলির সবটাই পাহাড়ি রাজ্য। এসব রাষ্ট্রের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতিকায় প্রাচীন অসমের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অসমে রাজবংশের শাসনকালে পাশের অঞ্চলগুলির স্থানীয় শাসকেরা অসমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তাও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফলে ওই যুগে রচিত ইতিহাসে অসমের বহু কথারও উল্লেখ রয়েছে। রাজ-পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সামরিক সাহায্য আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল এবং দূত প্রেরণের ব্যাপারটিও সহজ হয়ে পড়েছিল।

অসম এবং এর আশপাশের জনজাতীয় লোকেরা অধিকাংশ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর ছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির অধিকাংশ অঞ্চলে জনজাতীয় মানুষের বসবাস। নাগা জাতির মধ্যে নৃ-গোষ্ঠীয় উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এদিকে মেঘালয়ের খাসি জাতির লোকেরাও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর।

৯) 'লোকসংস্কৃতি-অধ্যয়নের জন্য প্রকৃতপক্ষে গোটা সমাজটাই একটা পুস্তকের মতো'—এই প্রসঙ্গে মতামত দাও।

উত্তর: অসমে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের প্রচলন জড়িত। অনেক লোকসংগীত আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে আর তার পাশাপাশি নতুন নতুন সংস্কৃতির প্রবল প্রচলন বেড়ে চলেছে। অসমের লোকসংগীতের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বর ও কন্যাকে বরণ করার সময় বহু ধরনের গীতের প্রচলন রয়েছে। এগুলিকে বিয়ানাম বলে খ্যাত। শিশুদের জন্য ঘুম পাড়ানি গান, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে গান, কামরূপী লোকগীত, গোয়ালাড়িয়া লোকগীত, দরঙের চিয়াগীত, গরখিয়া গীত ইত্যাদি। এসবের মধ্যে কামরূপী লোকগীত এবং গোয়ালপাড়িয়া লোকগীত অধিক জনপ্রিয়। সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত কয়েকজন বিশেষ খ্যাতি অর্জনকারীদের মধ্যে রয়েছে—খগেন মহন্ত, রামেশ্বর পাঠক ও প্রতিমা পাণ্ডে বরুয়া।

লোকগীতের পাশাপাশি বহু লোকনৃত্যের প্রচলন অসমের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অলম্বনে বৈষ্ণবীয় গীত এবং মনসা দেবীর তুষ্টির জন্য ওজাপালি গীত উল্লেখযোগ্য। লোকনৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ঢোটুলীয়, রচুলীয়া, দেওধনি, ভোরতাল, থিয়নাম, ওজাপালি নৃত্য। অসমের কামরূপ, নলবাড়ি, বরপেটা, দরং ইত্যাদি জেলায় এ ধরনের নৃত্য বিশেষভাবে প্রচলিত। কোনও জায়গার লোক সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ করলে সেখানকার অনেক কথা জানতে পারা যায়। সেজন্যই বলা হয়েছে— 'লোকসংস্কৃতি-অধ্যয়নের জন্য প্রকৃতপক্ষে গোটা সমাজটাই একটা পুস্তকের মতো'।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

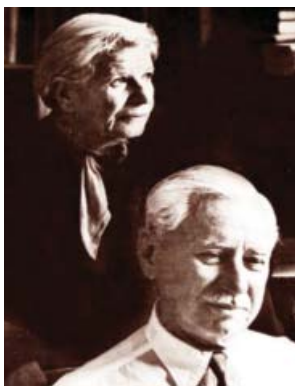

শিক্ষা হল সভ্যতার রূপায়ণ।
উইল ও এরিয়াল ডুরান্ট

ভাবনার জগতের সাথে একাত্ম হওয়া—এটাই হল শিক্ষা।
এডিথ হেমিলটন

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

লক্ষ্য হোক, নিরক্ষরমুক্ত ভারত

রেশমি চন্দ্র

মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটতে পারে শিক্ষার মাধ্যমেই। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া জীবনে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। সুশিক্ষা এবং মেধার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বোপরি শিক্ষা হল সকলের মৌলিক অধিকার। তাই দেশের প্রত্যেকটি মানুষের সাক্ষর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নিরক্ষরতা একজন মানুষের জীবনের সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। তেমনই একটি দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশি থাকলে নিরক্ষরতাই সেই দেশের উন্নয়নের সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্যেই ইউনেস্কোর আহ্বানে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে এবং নিরক্ষর মুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সাল থেকে ৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালিত হয়। বিশ্বের সকল মানুষকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং সমাজের সর্বস্তরে নিরক্ষতা দূরীকরণ করতে প্রতিবছর এই দিনটি পালন করা হয়।

শুধুমাত্র মানুষকে সচেতন করলেই চলবে না। সকলে যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষা অর্জনের পর সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে পারে সেই দিকেও নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন শুধুমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান থাকলেই তাকে 'সাক্ষর' বলা হতো। ১৯০১ সালে মানুষ গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে যে ব্যক্তি নিজের নাম লিখতে পারবেন তাঁকেই সাক্ষর বলা হতো। এরপর ১৯৪০ সালে ছোট ছোট বাক্য লিখতে ও পড়তে পারা এবং সহজ হিসাব-নিকাশ করতে পারা ব্যক্তিকেই সাক্ষর হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। আশির দশকে লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের ক্ষমতা সাক্ষরতার দক্ষতা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে সাক্ষরতার সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবন নির্বাহী দক্ষতা, প্রতিরক্ষার দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাও তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সাক্ষরতার দিক দিয়ে বিশ্বে ভারতের অবস্থান ১৪৭তম। এখানে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬১ ভাগ। প্রথমে রয়েছে জর্জিয়া। এদেশের সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগ। জর্জিয়া যদি পারে ভারত পারবে না কেন? আমরা কি কোনও দিনও বলতে পারব না ভারত নিরক্ষরতা দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে? সাক্ষরতা দিবস পালন করলেই তো দেশের সব মানুষকে সাক্ষর করা সম্ভব নয়, তাই নয় কি? এরজন্য আরও বেশি করে মানুষকে সচেতন করতে হবে। কারণ সাক্ষরতা মানুষকে সচেতন এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। দারিদ্র মুক্ত দেশ গড়তে প্রথমেই চাই শিক্ষা। দেশের নাগরিকদের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করতে পারলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করা সম্ভব হবে। তাই শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। সকলে যাতে শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পায় সেদিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনও রকম ভেদাভেদ রাখা উচিত নয়। সাক্ষর সমাজ মানেই বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী জনগণ। যে-দেশের জনগণ বাস্তববাদী এবং যুক্তি সম্পন্ন হবেন, সেই দেশের উন্নতিও ক্রমবর্ধমান হবে। সারা বিশ্বে লক্ষ্য করা যায় সাক্ষরতা আর উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে দেশে সাক্ষরতার হার বেশি তারাই উন্নয়নে এগিয়ে রয়েছে। দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রকৃত সাক্ষরতা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করে তার বাস্তবায়ন জরুরি।

সাক্ষরতার হার বাড়াতে ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি ও বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কিন্তু তবুও নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এরজন্য সমাজকে আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে। মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কারণ, লক্ষ করলে দেখা যাবে বর্তমানে এদেশে এখনও এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ঠিকমতো নিজের নামটুকুও লিখতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও নেই। রাস্তায় চলতে চলতে কত পরিবার দেখা যায় যাদের বসবাসের ঠিকানা ফুটপাত। তারা কি সাক্ষর? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর আসবে, না। এঁরা সাক্ষর না হলে এঁদের সন্তানদের সাক্ষর করবেন কী করে? নতুন প্রজন্মই তো উজ্জ্বল দেশ গড়ার কারিগর। এইভাবে কি উজ্জ্বল দেশ গড়া সম্ভব? তাই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে এবং নিরক্ষর মুক্ত দেশ গড়তে নারী, কন্যাশিশু, পথশিশু, কর্মজীবী শিশু-কিশোর, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকা, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পতিতালয়, সকল সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, অনাথ ও ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রের নারী ও শিশু, তরুণদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সকলকে একটা কথা মনে রাখতে হবে শিক্ষা সুযোগ নয়, এটা অধিকার। শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে। সকলে শিক্ষিত হলে, নিরক্ষর-মুক্ত দেশ গড়তে পারলে নিপীড়িত, শোষিতদের সংখ্যাও কমবে। দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। বিশ্বের দরবারে ভারতকে নিরক্ষর-মুক্ত করাটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই আমরা দেশ ও জাতির জন্য গর্ব করতে পারব।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা

ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সৃষ্টির মূলে আছে অখণ্ডতা, অনন্ত প্রাণ ও শক্তির প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন গভীর একাত্মবোধ থেকে সঞ্জাত। এই একাত্মবোধ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, বিশ্বমানবের সঙ্গে। এই যোগ অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে। প্রস্ফুটিত করে অভ্যন্তরস্থ হৃদয়পদ্মকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

''বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো—
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দ ধন হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও।।''

ছাত্রজীবনে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কতগুলো পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা তা তাঁর পছন্দ হয়নি। বেশ কয়েকবার স্কুলে পাঠানো হলেও তিনি ফিরে এসেছেন বিদ্যালয়ের গণ্ডিবদ্ধ জীবন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশাসন থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তাঁকে বিলেতেও পাঠানো হয়েছিল। তাতেও কোনও ফল হয়নি। অথচ গৃহে বা উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে তাঁর শিক্ষা অর্জন চলেছে নিরন্তর। কেন এমন হল? তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক: ''যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহার মধ্যেই কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহার মধ্যেই শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে যে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।''

স্কুলপালানো ছাত্র রবীন্দ্রনাথ 'স্কুল' নামক অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছেন আজন্মকাল। চেয়েছেন শিক্ষার মুক্ত আকাশ যেখানে শিশু প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে মনের আনন্দে লেখাপড়া শিখবে। দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশ হবে। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হবে, শিশু হয়ে উঠবে একজন বাঙালি, একজন ভারতীয়-বিশ্বনাগরিক, এক মানুষের মতো মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাগ্রহণ দুটিকে পৃথকভাবে দেখেছেন। বিদ্যাচর্চা অনেকটা স্মৃতিনির্ভর, তার পদ্ধতিও নীরস। শিক্ষাগ্রহণ চিন্তা ও কল্পনানির্ভর। আনন্দময় অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ নীরস বিদ্যাচর্চাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি বুঝেছিলেন বিদ্যার চেয়ে শিক্ষা ঢের বড় জিনিস। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। তিনি পুঁথিগত পণ্ডিত চাননি। নির্ভেজাল শিক্ষিত মানুষ চেয়েছিলেন।

পরাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় তথা বাঙালির শিক্ষা সম্পর্কে যা চিন্তা করেছিলেন তা অনেক দিক থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার সঙ্গে সংগতি প্রকাশ করে। তিনি বলেছেন: ''চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুটো পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ কথা অতি পুরাতন।''

বস্তুত, তাঁর সারা জীবন ধরে তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক, দুটি দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে যা ভেবেছেন, তাতে জোর পড়েছে মনুষ্যত্বলাভের উপর। তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল মনুষ্যত্ব লাভ, জীবনকে সবদিক থেকে উদ্বোধিত করা, প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো, নিজেকে বিকশিত করা, পরিপূর্ণ হওয়া।

এটিকে বলা হয় শিক্ষার উচ্চতর আদর্শ, আর 'ব্যবহারিক সুযোগ লাভ' বা জীবিকার জন্য শিক্ষা হল শিক্ষার 'নিম্নতর লক্ষ্য'। শিক্ষা শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়, তা অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ, শিল্পবৃত্তির সাধনা, কর্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির সাধনা। একেই বলা হয়েছে 'পরিপূর্ণতার সাধনা' বা 'Education of fulness'। ঔপনিষদিক আদর্শ আর পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী আদর্শের সমন্বয় সংযোগে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব, তারই অনুষঙ্গী শিক্ষাতত্ত্ব। তাই এরই পরিপূর্ণতার সাধনার কথা বলেছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিকতা তাঁর মানবতত্ত্বের মধ্যেই নিহিত। তিনি জানতেন, সৃজনশীলতা মানুষের স্বধর্ম। সে যদি কবি, গায়ক, ভাস্কর, চিত্রকর নাও হয়, তবু সব মানুষই শিল্পী। অন্যভাবে বলতে গেলে জীবনশিল্পী— সে নিজেকে, নিজের পরিবেশকে সৃষ্টি করে— সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে শিক্ষার এই উচ্চতম লক্ষ্য পূরণে আমরা সক্ষম হতে পারিনি। এর কারণ কী? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন: ''ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।''

শিক্ষাকে কেবল ডিগ্রি অর্জন ও ওকালতি, ডাক্তারি, কেরানিগিরি বা যে কোনও পেশায় নিযুক্তি এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে বেঁধে না দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা হবে জীবনমুখী। জীবনমুখী শিক্ষাই হল উপলব্ধি ও প্রয়োগের শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ হবে, দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক। শিক্ষা হবে সৃজনশীল ও আনন্দময়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: ''আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতগুলি কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না। বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি। কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।''

রবীন্দ্রনাথ আদর্শ শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র জ্ঞানমুখী শিক্ষার কথা বলেননি। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়, মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় তাই প্রকৃত শিক্ষা।

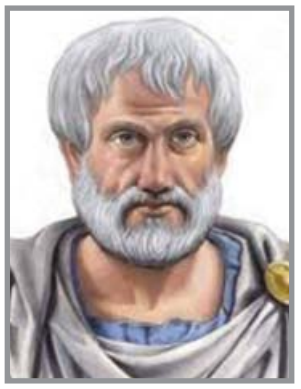

সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা।
অ্যারিস্টটল

আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই আমাদের অজ্ঞানতাকে আবিষ্কার করি।
শেলি

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ২ মে ২০১৭

জেনারেল নলেজ | বিদিশা রায়চৌধুরী

ফেসবুকে জনপ্রিয় পরিবেশ সংগঠন

পরিবেশ রক্ষা করার পূর্ব শর্ত হল, পরিবেশ তথা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে জানতে হবে। প্রকৃতির মাঝে বাস করা ক্ষুদ্র পোকামাকড় থেকে শুরু করে প্রতিটি স্থলজ ও জলজ প্রাণীর থাকার জন্য তাদের বাস্তুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সঠিক রাখা জরুরি। আর তার জন্য পরিবেশের সুরক্ষায় মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বে প্রতিনিয়ত একাংশ মানুষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের এই পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পরিবেশের সবকটি জীবনকে সজীব রাখতে গড়ে তোলা হয়েছে কিছু সংগঠন।

বর্তমান যুগে ফেসবুক হচ্ছে একটি অন্যতম জনপ্রিয় সোশ্যালসাইট। বেশিরভাগ মানুষেরই রয়েছে এই সাইটে অ্যাকাউন্ট। তাই শুধুমাত্র অফিসিয়াল পেজের ‘লাইক’ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি বহুলপরিচিত গণমাধ্যম ‘মাদার আর্থ নেটওয়ার্ক’ ফেসবুকে জনপ্রিয় কয়েকটি পরিবেশ সংস্থার নাম প্রকাশ করেছে। যাদেরকে ‘ফেসবুক পরাশক্তি’ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আসুন আজ জেনে নিই সেই পরিবেশ সংগঠনগুলি সম্পর্কে এবং জেনে ফেলি, কেমনই বা তাঁদের কাজের ব্যাপ্তি।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (WWF): পাঁচ মিলিয়নের বেশি মানুষের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ডব্লিউ ডব্লিউ এফ। আগে এটি ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড’ নামে পরিচিত ছিল। বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩০০টি পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে এই সংস্থাটি। এর উল্লেখযোগ্য দুটি প্রকল্প হল, ‘গোরিলা প্রকল্প’ এবং ‘টাইগার পপুলেশন’। সংস্থাটির অফিশিয়াল পেজটি অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় ফেসবুকে বেশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। বর্তমানে সংস্থাটি বহুল আলোচিত তথ্যচিত্র ‘প্ল্যানেট আর্থ’-এর পরবর্তী সিক্যুয়েলের জন্য কাজ করছে।

দ্য ওয়াইল্ড ক্যাট সেঞ্চুয়ারি: বাংলায় বলা যায় বনবিড়াল আশ্রয়স্থল। ১৯৯৯ সালে ব্যক্তিগত অনুদানে গড়ে ওঠা এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বনবিড়াল থেকে শুরু করে বাঘ, সিংহ, চিতা, জাগুয়ার এসব পশু বিভিন্ন ধরনের উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা। বন্যপ্রাণীদের বন্দি রাখা এবং প্রদর্শনী শিল্পের বিরুদ্ধেও এটি কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি ৪০ একর জমির উপর প্রায় ১২০টি বণ্যপ্রাণীদের আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে বেঙ্গল টাইগার, আফ্রিকান সিংহ ও ববক্যাট প্রাণীও রয়েছে। প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য আশ্রয়স্থলটি সবার জন্য উপযুক্ত।

গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল: বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে গ্রিনপিসের অফিস রয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৫০০০ স্বেচ্ছাসেবক সহ কর্মী সংখ্যা প্রায় ২৪০০। ফেসবুকের জনপ্রিয় পরিবেশ সংগঠন তালিকার তৃতীয় স্থানে থাকা এই অলাভজনক সংস্থাটিকে সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। বন রক্ষায় এমনকী তেল নিষ্কাশন রোধ করে উত্তর মেরু রক্ষা করতে, গ্রিনপিসের প্রচারে যুক্ত কর্মীদের সৃষ্টিশীল এবং সাহসী শারীরিক কসরত সুপরিচিত।

বিগ ক্যাট রেসকিউ: ১৯৯২ সালে গঠিত এই সংস্থাটিকে বর্তমানে বিগ ক্যাটদের বিশ্বের বৃহত্তম আশ্রয়স্থল বলা হয়। ফ্লোরিডায় ৪৭ একর জায়গার উপর গড়ে ওঠা এই সংস্থায় ১১টি প্রজাতির প্রায় ১০০টিরও বেশি বাঘ, বনবিড়াল ও সিংহ রয়েছে। চিড়িয়াখানা ও সার্কাসে পশুদের অপব্যবহার ঠেকানোর জন্য সংস্থাটি বিখ্যাত।

সি শেফার্ড গ্লোবাল: সামুদ্রিক জীব নিয়ে কাজ করা এই সংস্থাটি বিশ্বের কাছে পরিচিতি পেয়েছে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল ‘অ্যানিমেল প্ল্যানেট’-এ তিমিদের নিয়ে ‘ওয়েল ওয়ার্স (whale wars)’ নামক তথ্যবহুল শো’টির মাধ্যমে। ‘নেপচুনস নেভি’ হল সংগঠনটির নৌ বহর, যেখানে প্রায় চারটি জাহাজ রয়েছে। সি শেফার্ডের বর্তমান প্রচারাভিযানগুলোর অন্যতম কয়েকটি হল, জাপানে ডলফিন সংরক্ষণ, ফারো দ্বীপপুঞ্জে পাইলট তিমি সংরক্ষণ, কোস্টারিকায় কচ্ছপ সংরক্ষণ এবং এনার্টিকায় টুথফিস সংরক্ষণ।

দ্য নেচার কনজারভেন্সি: ১৯৫১ সাল থেকে মূলত ভূমি এবং জলের সুরক্ষায় নিয়োজিত এই সংগঠনটি বিশ্বের প্রায় ১২০ মিলিয়ন একরের বেশি জমি এবং প্রায় ৫০০০ মাইল নদী সুরক্ষায় কাজ করে আসছে। বর্তমানে প্রায় ১০০টি সামুদ্রিক সংরক্ষণ বিষয়ক প্রকল্পে কাজ করছে এই সংস্থা। এর সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি কাজের মধ্যে একটি হল, তারা ২০২৫ সালের মধ্যে ব্রাজিলের আটলান্টিক বনে গাছের চারা রোপণ করে প্রায় ২৫ লক্ষ একর বনভূমি পুনরুদ্ধারের প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং সেভাবেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফেডারেশন: মার্কিন যুক্তরাষ্টে বর্তমানে বৃহত্তম ব্যক্তিগত অলাভজনক সংরক্ষণ সংস্থা এটি। প্রকৃতির সাথে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংস্থাটির কাজের মধ্যে আরও রয়েছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার করা। এই দলটির সাম্প্রতিক কিছু অভিযানের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল, পরিবেশ আইন শক্তিশালীকরণ, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বুনো মোষ উদ্ধার এবং সবশেষে আছে শিশুদের প্রকৃতির সান্নিধ্যে যতটা সম্ভব নিয়ে আসা।

ডিফেন্ডার্স অব ওয়াইল্ড লাইফ: জনপ্রিয়তার তালিকায় আট নম্বরে থাকা এই সংস্থাটিকে বাংলায় বলা হয় ‘বন্যপ্রাণী রক্ষাকর্মী’, এক কথায় ‘বনের রক্ষক’। উত্তর আমেরিকার উদ্ভিদকুল এবং প্রাণিকুলকে রক্ষার প্রচেষ্ঠা হিসাবে এটি ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির সাফল্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলীয় একটি রাজ্য ইয়মিং-এর কিছু ‘গ্রে ডলফ’ নাম বন্য নেকড়েকে উদ্ধার করার কথা। এছাড়া সংস্থাটি বিপন্ন হয়ে যাওয়া তিমির বাসস্থান সুরক্ষাকরণসহ রুখে দিয়েছে বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির মধ্যে দিয়ে সড়ক পথ নির্মাণও।

এনভায়রনমেন্টাল ওয়ার্কিং গ্রুপ: আমেরিকার এই সংস্থাটির নামেই শোভা পাচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য। সংস্থাটির কৃষিতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি আলোচিত প্রকল্পে কাজ করেছে এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে বিখ্যাত হল ‘ডার্টি ডজেন’, যেখানে খাদ্যদ্রব্যের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলোকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সংস্থাটির আরও কয়েকটি প্রকল্পের নাম হচ্ছে— ‘মোবাইল ফোনের বিকিরণ ও স্বাস্থ্য’, ‘স্কিন ডিপ’ এবং ‘সানস্ক্রিন’।

ওশ্যান কনজারভেন্সি: মহাসাগরগুলোর বৈচিত্রময় বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষায় কাজ করে আসছে ওশ্যান কনজারভেন্সি। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মহাসাগর নীতির বাস্তবায়ন এবং বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী কাজ ‘বার্ষিক আন্তর্জাতিক উপকূলবর্তী পরিষ্করণ’ এই সংস্থাটির অধীনে রয়েছে (২০১৪ সালে ৬৪৮০০০-এর বেশি অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে), মহাসাগরীয় জলপথ থেকে ওশ্যান কনজারভেন্সি গত ২৫ বছর ধরে আনুমানিক ১৪৪ মিলিয়ন পাউন্ড আবর্জনা পরিষ্কার করেছে।

আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ ফাউন্ডেশন: ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আফ্রিকার বন্যপ্রাণী এবং ভূমি রক্ষায় নিয়োজিত নেতৃস্থানীয় একটি আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ সংস্থা। জনপ্রিয়তায় যদিও এটি ১১ নম্বরে অবস্থান করছে কিন্তু এর কাজের পরিসরকে খাটো করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। চোরাশিকারিদের হাত থেকে আফ্রিকার বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতি, চিতাবাঘ, গন্ডার এবং জিরাফ, সহ আরও প্রজাতি সংরক্ষণ করে আসছে এরা। দলটি অতি সম্প্রতি দক্ষিণ অফ্রিকায় গন্ডারের শিং বাণিজ্য বৈধ করার একটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে।

সিয়েরা ক্লাব: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিবেশ বিষয়ক ক্লাবটি গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন অলাভজনক সংস্থা, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সালে। প্রায় ১২২ বছর ধরে এই সংগঠনটির পরিবেশ নিয়ে কাজ করে আসছে। পরিবেশের সুরক্ষায় কাজ করা নতুন সংস্থাগুলো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকদের যোগাবে এই প্রাচীন সংস্থাটির কর্মক্ষেত্র। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে তাদের দ্বারা চালিত প্রচার ‘বিয়ন্ড কোল ক্যাম্পেইন’-এর মাধ্যমে প্রায় ১৮৫টি কয়লা প্লান্ট বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে, যার পুরস্কারস্বরূপ সংগঠনটি ৩ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান পেয়েছে নিউ ইয়র্ক শহরের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গের কাছ থেকে। ২০১৭ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কয়লা প্লান্ট রুদ্ধ করে দেওয়া অথবা তাদের কার্বন নিঃসরণ কমাতে বদ্ধপরিকর এই সংগঠনটি।